Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual- Peer Reviewed-Bi-Annual
Digital Research Journal
Website : santiniketansahityapath.org.in
Volume-2 Issue-2 January 2024
ISSN 2583-6706 (Online)

বাংলা কথাসাহিত্যে প্রতিফলিত জাতীয়করণ পূর্ববর্তী খনিজীবন

ঝুমা পাত্র

Link : https://bit.ly/3Sursr8

সারসংক্ষেপ : পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত রানিগঞ্জকে কেন্দ্র করেই কয়লা-শিল্পাঞ্চল গড়ে ওঠে। প্রায় আড়াইশো বছরের ইতিহাসে কয়লা শুধুমাত্র জ্বালানি হিসাবেই নয় এই অঞ্চলটিকেও বিশেষ প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। কয়লাখনিকে কেন্দ্র করে হাজার হাজার ভারতীয় কর্মসংস্থানের জন্য বিভিন্ন প্রদেশ থেকে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে। বংশানুক্রমিক ভাবে বসবাস করে তারা এই অঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দায় পরিণত হয়েছে। ফলে ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও নানা জাতি নানা ভাষা মিলেমিশে এখানে একাকার হয়ে গেছে। তাই পশ্চিমবঙ্গের রানিগঞ্জ-আসানসোল অঞ্চলে যেন একটি ছোটো ভারতবর্ষের চিত্র আমরা দেখতে পাই। বঙ্গসংস্কৃতির পাশাপাশি গড়ে উঠেছে আর একটি নব মিশ্রসংস্কৃতি। সংস্কৃতি প্রতিফলিত হয় সাহিত্যের মধ্য দিয়েই। এই অঞ্চলের লেখকগণ জন্মসূত্রে তথা কর্মসূত্রে খনিজীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই এই লেখকদের রচনায় শিল্পজীবনের বাস্তব ও তথ্যসমৃদ্ধ ছায়াপাত ঘটেছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কর্মপ্রবাহ যেমন পরিবর্তিত হয়েছে সাহিত্যেও সেই বিবর্তন ধরা পড়েছে। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের পর তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও যশোদাজীবন ভট্টাচার্য, প্রফুল্লকুমার সিংহ, দেবদত্ত রায় প্রমুখ সাহিত্যিকদের কলমে খনি অঞ্চলের মানুষ ও সমাজ চিত্রের একটি ধারাবাহিক পরিচয় ফুটে উঠেছে। বিশ শতকের কুড়ির দশক থেকে দীর্ঘদিন শ্রমিক আন্দোলনের পর ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের ১৫ জানুআরি ভারতের কয়লাখনিগুলি জাতীয়করণ করা হয়। আমাদের এই অধ্যায়ে আলোচনার বিষয় হলো জাতীয়করণ পূর্ববর্তী কয়লাখনির সাহিত্য। তাই কয়লাখনির আবিষ্কার অর্থাৎ আঠারো শতক (১৭৭৪) থেকে শুরু করে জাতীয়করণের সীমায় খনি জীবন বাংলা সাহিত্যকে কতটা প্রভাবিত করেছে তার একটি রূপরেখা চিত্রণের চেষ্টা করেছি।

সূচক শব্দ : কয়লাখনি, কোলিয়ারি, ট্রেড ইউনিয়ন, শ্রমিক, কয়লাকুঠি, ম্যানেজার, কয়লাশিল্প

পাশ্চাত্য সাহিত্যের কিছুটা ছোঁয়া লেগে বাংলা সাহিত্যে শিল্পনগরী নিয়ে সাহিত্য লেখার দিকে ঝোঁক শুরু হয় অনেক লেখকেরই কলমে। বাংলায় চটকল, চা বাগান প্রভৃতি শিল্পকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু উপন্যাস রচিত হয়েছিল। কিন্তু কয়লাশিল্প ছিল অধরা। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় কয়লাখনি নিয়ে গল্প লিখে বাংলা সাহিত্যে একটি নতুন দিক তুলে ধরলেও সেই বর্ণনায় পাঠকের কৌতূহল নিরসনের জন্য পর্যাপ্ত উপাদান সামগ্রীর অভাব ছিল। তাই রানিগঞ্জ-আসানসোল কয়লাখনির বাস্তব চালচিত্র জানতে আমাদের আরো অপেক্ষা করতে হয়েছে। কথাসাহিত্যে অভিজ্ঞতা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই সেই সাহিত্য গড়ে উঠল সাহিত্যপ্রেমী খনি অঞ্চলের কর্মীদের হাতেই।

পাশ্চাত্য সাহিত্যের কিছুটা ছোঁয়া লেগে বাংলা সাহিত্যে শিল্পনগরী নিয়ে সাহিত্য লেখার দিকে ঝোঁক শুরু হয় অনেক লেখকেরই কলমে। বাংলায় চটকল, চা বাগান প্রভৃতি শিল্পকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু উপন্যাস রচিত হয়েছিল। কিন্তু কয়লাশিল্প ছিল অধরা। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় কয়লাখনি নিয়ে গল্প লিখে বাংলা সাহিত্যে একটি নতুন দিক তুলে ধরলেও সেই বর্ণনায় পাঠকের কৌতূহল নিরসনের পর্যাপ্ত উপাদান সামগ্রীর অভাব ছিল। তাই রানিগঞ্জ-আসানসোল কয়লাখনির বাস্তব চালচিত্র জানতে আমাদের আরও অপেক্ষা করতে হয়। কথাসাহিত্যে অভিজ্ঞতা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই সেই সাহিত্য গড়ে উঠল সাহিত্যপ্রেমী খনি অঞ্চলের কর্মীদের হাতেই।

রানিগঞ্জ কয়লাখনি অঞ্চল নামে সমধিক প্রসিদ্ধ পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চলকে ভিত্তি করে যে বৃহৎ শিল্পভূমি গঠিত হয়েছে তার সূচনা দু'শো বছরেরও আগে। ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলার পশ্চিমাঞ্চলে কয়লাখনি আবিষ্কৃত হবার পর, এই অঞ্চলের জনপদ ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়েছে। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে, রানিগঞ্জের পার্শ্ববর্তী এগরা গ্রামে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে কয়লা উত্তোলন

শুরু হলে রানিগঞ্জ শহরকে কেন্দ্র করে কয়লা শিল্পের বিকাশ ও বিস্তৃতি ঘটে। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে রানিগঞ্জ পর্যন্ত রেলপথের প্রসার এবং সন্নিহিত অঞ্চলে কয়লাখনি আবিষ্কৃত হবার পর রেলপথও আসানসোলে উপনীত হয়ে সেখানে এক বৃহৎ সংসার গড়ে তুলেছে। কয়লাশিল্পের প্রসারে রেলপথ গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। কয়লা শিল্পকে ভরসা করে ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে কুলটি এবং ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে বার্ণপুরে গড়ে উঠেছে লৌহ ও ইস্পাত কারখানা। স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলা বিহার সীমান্তে চিত্তরঞ্জনে রেল ইঞ্জিন কারখানা ও দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা প্রতিষ্ঠার পর, চিত্তরঞ্জন থেকে পানাগড় পর্যন্ত কয়লা, লৌহ-ইস্পাতশিল্পকে সামনে রেখে নানা ধরণের অসংখ্য সরকারি ও বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠায় এই অঞ্চলের জনপদ ও ভৌগোলিক পরিচয় নতুন ধারায় রূপ পায়।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে জীবিকার প্রয়োজনে ও অন্বেষণে এই বৃহৎ শিল্পাঞ্চলে অনেক মানুষ এসেছেন। তাই বঙ্গ সংস্কৃতির পাশাপাশি গড়ে উঠেছে আর একটি নব মিশ্রসংস্কৃতি। শিল্প গড়ে ওঠার কেন্দ্রে আছে মালিক ও শ্রমিক তাই মালিক-শ্রমিক চরিত্র ব্যতীত খনি সাহিত্য নয়। স্বাভাবিক ভাবেই এই অঞ্চলের লেখকদের রচনায় শিল্প জীবনের ছায়াপাত ঘটেছে। খনি অঞ্চলের জীবনকে প্রথম সাহিত্যের আঙ্গিনায় প্রতিষ্ঠিত করেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০১-১৯৭৬)। জন্ম এবং কর্মসূত্রে খনি এবং খনিতে কর্মরত মানুষগুলির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল অবিচ্ছেদ্য। 'মাসিক বসুমতী'তে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'কয়লাকুঠি' নামক ছোটোগল্পের মধ্য দিয়েই শৈলজানন্দ বাংলা সাহিত্য জগতে পদার্পণ করেন। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'মহাযুদ্ধের ইতিহাস' (১৯২৬), 'নীহারিকা ওয়াচ কোম্পানী' (১৯৫৮) ও 'কয়লাকুঠির দেশ' (১৯৫৮) উপন্যাসগুলিতে খনি অঞ্চল বর্ণিত হলেও তাঁর ছোটো গল্পগুলির মতো খনি অঞ্চলের জীবনযাত্রা বাস্তবায়িত রূপ লাভ করতে পারেনি।

কয়লাখনির সূচনাপর্বে ইংরেজদের মাধ্যমেই কয়লা খনি পরিচালিত হতো। অধিকাংশ খনি শ্রমিকই আসত ওড়িশা, বিহার ও উত্তরপ্রদেশ থেকে। তাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হতো। খনিতে নারী শ্রমিকরাও কাজ করত। তবে নিরাপত্তার যথেষ্ট অভাব ছিল। কর্মীদের স্ত্রীর উপর মালিকের অধিকার থাকত। ক্রীতদাসদের মতোই শ্রমিকদের জীবন কাটত।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত স্বাধীন হলেও শ্রমিকদের জীবনে কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেনি। অনেক খনিতে ইংরেজ মালিক তার পরেও শাসন চালাতেন। দেশীয় মালিকরা বিশেষ দক্ষতা সহকারে খনি পরিচালনায় অসমর্থ ছিলেন। যান্ত্রিক দিক থেকে বেশ কিছুটা উন্নতি হলেও খনির নিরাপত্তা নিয়ে তখনো ভাবা হতো না। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে খনি শ্রমিকেরা যুক্ত হয়ে নিজেদের স্বাধীনতা লাভের জন্য আন্দোলনে নামে। এই সময় থেকে নারী শ্রমিকদের খাদে কাজ করা কমানো হয়।

১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে দীর্ঘদিন আন্দোলনের পর কয়লা খনিগুলি জাতীয়করণ করা হলো। বহু মালিক মালিকত্বহীন হলেন। তবে শ্রমিকরা কঠিন পরিশ্রমের বিনিময়ে অনেক সুযোগ-সুবিধা লাভ করল। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের প্রাক্‌রাষ্ট্রায়ত্তকরণ সময় পর্যন্ত জাতীয়করণের পূর্ববর্তী পর্ব। বহু সাহিত্যিকের রচনায় এই সময়টি সাহিত্যে উঠে এসেছে। সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পেও খনিজীবন নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের পর কয়লা শিল্প নিয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য রচনা করেছেন প্রফুল্লকুমার সিংহ। তাঁর জন্ম আসানসোল শহরের কয়েক মাইল উত্তরে জামগ্রামে। আবাল্য কেটেছে কয়লা মজুর অধ্যুষিত পরিবেশে। পরবর্তীকালে জীবিকা হিসাবেও বেছে নিয়েছিলেন কয়লাশিল্পকে। ফিল্ড অ্যাপ্রেনটিস হিসাবে জীবন শুরু করেন। প্রথমে সেকেন্ড ক্লাস পরে ফার্স্ট ক্লাস ম্যানেজারশিপ পাশ করেন। এই এলাকার মানুষদের সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা, গভীর ভালোবাসা ও সহানুভূতির কথা তিনি লিখে রেখে গেছেন উপন্যাস, গল্প ও প্রবন্ধ সংকলনে। উপন্যাসগুলির মধ্যে রয়েছে ট্রিলজি — 'মহাকালের ঘোড়া' (১৯৮৬), 'অনার্য দামোদর' (১৯৯৮) এবং 'ভূমিগর্ভ'। এই রচনাগুলির মধ্যে রয়েছে কয়লাখনি এলাকার মানুষের বিশিষ্ট জীবনযাপন, কয়লা খনির অভ্যন্তরের নানা খুঁটিনাটি বিবরণ বিভিন্ন শ্রমিক আন্দোলন কয়লাশিল্পকে ঘিরে। তাঁর উপন্যাসগুলি প্রসঙ্গে সমালোচকের মত প্রণিধানযোগ্য —

"কয়লাকুঠির কালো যবনিকার অন্তরালে বহু ইতিহাস, বহু মানুষ, বহু লোকাচার এবং কিংবদন্তি। সেই ঐতিহাসিক পটভূমিতে যেসব ক্রান্তিকাল ছিল সেই সমসাময়িক কালের চরিত্র, ঘটনা, সমাজ ও শিল্প নিয়ে পাঁচ-ছটি উপন্যাস রচনার মাস্টারপ্ল্যান মোতাবেক 'মহাকালের ঘোড়া' প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, কয়লাকুঠির আদিপর্ব থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী ট্রেড ডিপ্রেসন পর্ব পর্যন্ত বিধৃত হয়েছে। শিল্প বিপ্লবের গতি সঞ্চার ও স্বাধীনতা উত্তরপর্বে কয়লা অঞ্চলে ট্রেড ইউনিয়নের প্রাণপণ সংগ্রামের সত্যনিষ্ঠ বিবরণ দাখিল করেছেন অনার্য দামোদর উপন্যাসে।"[১]

এই তিনটি গ্রন্থের পর 'ভূমিগর্ভ' উপন্যাসে 'অনার্য দামোদর' পরবর্তী সময় থেকে একেবারে কয়লাখনির রাষ্ট্রীয়করণ সময়ের বর্ণনা এই বইতে ধরা আছে। এই চারটি বই পড়লে কয়লাখনির দু'শো বছরের কথা জানা যাবে। এছাড়াও 'জনপদ', 'জনরব'ও 'জনমানব' নামে তাঁর আরো তিনটি উপন্যাসে তিনি এই অঞ্চলের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী—জমিদার, কর্মচারী, দালাল, ফড়ে,

স্থানীয় সাধারণ মানুষ, ব্যবসায়ী, কয়লার চোরাকারবারি এরকম বহু মানুষের কথা রয়েছে। প্রফুল্ল সিংহের উপন্যাসগুলি শুধু ইতিহাস ও ঘটনাবলীর বিবরণ মাত্র নয় — রীতিমতো একটি নতুন ধারার সাহিত্য। তাঁর ভাষা, শব্দ চয়ন, স্থানীয় মানুষের মুখের ভাষার সঙ্গে নাগরিক ভাষার মিলিত প্রবাহে যথেষ্ট শক্তিশালী ও ঘাতসহ হয়ে উঠেছে। কোনো একটি জনজীবন নিয়ে এত বিস্তৃত অন্তরঙ্গ কাজ ভারতবর্ষে অন্য কোনো ভাষায় বা সারা পৃথিবীতে অন্য কেউ করেছেন কিনা সন্দেহ।

প্রফুল্ল সিংহের 'মহাকালের ঘোড়া', 'অনার্য দামোদর', 'ভূমিগর্ভ' উপন্যাসগুলি জাতীয়করণ পূর্ববর্তী শ্রমিক-সমস্যা নিয়েই রচিত। 'মহাকালের ঘোড়া' (১৯৮৬) উপন্যাসের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে কয়লা খননের ইতিহাস। ব্যারাকলউ সাহেব নামে সাহেব চরিত্রটি সুদূর বিদেশ থেকে ভারতে এসেছিলেন কয়লা খনি চালু করে অর্থ উপার্জন করার ইচ্ছে নিয়ে। তিনি মদ্যপ, নারীলোলুপ, শৌখিন। অপরদিকে কঠোর চরিত্রের সাহেব কয়লা খনির উন্নতিকল্পে সারাদিন ব্যস্ত থাকেন। নিজে খনির ভেতর নেমে তদারকি করেন। এই কাজে তাঁর কোনোরকম কুণ্ঠা বা আলস্য নেই। খনির উন্নতি তথা নিজের খনিমালিক হিসেবে সুনাম অর্জনে তিনি সর্বদা সচেষ্ট। মহাকালের ঘোড়ার মতোই তিনি ছুটে চলেছেন ভবিষ্যতের দিকে। কোনো বাধা তাঁকে থামাতে পারে না। লেখকের কথায়,

"দুর্বার গতিতে ছুটে চলেছে মহাকালের ঘোড়া। দেশ, কাল ও পাত্রের গণ্ডী অতিক্রম করে, যুগ যুগান্তরে, তার বিরামহীন যাত্রা। ঘোড়ার ক্ষুরের দাগে দাগে কত জন্ম-মৃত্যুর খতিয়ান। কত জাতির উত্থান ও পতন। কত সভ্যতার সৃষ্টি ও বিলুপ্তি।"[২]

বস্তুত কয়লাকুঠির সাহেব ব্যারাকলউ, বরনারী কাবেরী, জমিদারবাবু ও অসংখ্য কুলি কামিন কাউকেই লেখক ছাঁচে ঢালা পুতুল বানান নি; তারা প্রত্যেকেই বাস্তব মানুষ। কয়লাখনি আবিষ্কার ও খননকার্যে পরিচালনায় ইংরেজ সাহেবরা যে অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের মধ্য দিয়ে ভারতের কয়লাশিল্পকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তার জীবন্ত দলিল 'মহাকালের ঘোড়া' উপন্যাস।

'জনরব', 'জনপদ' উপন্যাস দুটিতে চিত্রিত হয়েছে খোলামুখ কয়লাখনিকে কেন্দ্র করে মাফিয়াদের চোরাকারবারের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন। অর্থাৎ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে ব্যবসা পদ্ধতি। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দ থেকে কয়লা খনিতে কাজ করা শ্রমিকদের সুবিধের জন্য বেশ কিছু নীতি বিধিবদ্ধ হতে থাকে, যদিও তা উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। প্রফুল্লকুমার সিংহের 'জড় ও জমিন' গল্পে দেখি জমির বিনিময়ে মুথা খনিতে মাল কাটার চাকরি লাভ করে। তার মৃত্যুর পর তার স্ত্রী চাকরি পায়। তার স্ত্রী দ্বিতীয়বার এক ব্যক্তিকে বিয়ে করলে স্ত্রীর চাকরিটি দ্বিতীয় স্বামী লাভ করে। এভাবেই একটি পরিবার বংশপরম্পরায় কয়লা খনিতে কর্মী হওয়ার যোগ্যতা লাভ করে। তবে দেশ স্বাধীন হলেও খনি অঞ্চলের শ্রমিকদের কাজ করতে হয় অন্ধকারে, কর্দম যুক্ত স্থানে। 'ধ্বস' গল্পে দেখা যায় শ্রমিকের প্রাপ্য মূল্য মেলে না, আটকে যায় বিল। প্রাবন্ধিক সুনীল বসু রায়ের মন্তব্য এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য —

"কয়লাশিল্প ছিল যা খুশি তাই করার রাজত্ব। তেমনি অবাধ স্বাধীনতা ছিল কয়লাখনির ইংগ-ভারতীয় মালিকদের শ্রমিক শোষণের। কী ভয়াবহ শোষণ! ১৯৩৭ সালে একটি কয়লাখনি কোম্পানির বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতির ভাষণে জনৈক ইংরেজ খনি ম্যানেজার জানান যে এক-একটা গোটা পরিবারই খনিগর্ভে কাজ করতো। বাবা-মা, ছেলে-মেয়ে সবাই। এক নাগাড়ে ডবল সিফট কাজও তারা করতো। খাওয়া, ঘুমানো সবই খনির নীচে। কাজ থেকে রেহাই পেতো না অন্তঃসত্ত্বা নারীও। উক্ত ম্যানেজার জানান যে, একবার এক অন্তঃসত্ত্বা নারী শ্রমিক খনিগর্ভে দুটি যমজ কন্যা সন্তান প্রসব করেছিল। তারা বেঁচে ছিল। বড়ো হয়েছিল। বিয়ের পরে তারা স্বামীদের সাথে ঐ খনিতেই কাজ করত। কয়লাখনি শিল্পে শ্রমশক্তির শোষণের তীব্রতা ছিল দুঃসহ।"[৩]

শক্তিপদ রাজগুরুর (১৯২২-২০১৪) বহু ছোটোগল্প ও উপন্যাসের পটভূমি খনি অঞ্চল। 'কুসুমপুরের যৌবন' (১৯৮৩), 'কয়লার রং কালো' (১৯৭৪) ও 'কেউ ফিরে নাই' (২০০১) এই তিনটি উপন্যাসই কয়লাখনি অবলম্বনে রচিত হয়েছে। শুধু মালিকের শাসনে শ্রমিকরা অত্যাচারিত হয়। কিন্তু এর বিপরীত উদাহরণ 'কুসুমপুরের যৌবন'। কল্পনার সংমিশ্রণে উপন্যাসের কাহিনি কুসুমপুর গ্রামকে কেন্দ্র করে লিখিত হয়েছে। আসানসোল-রানিগঞ্জের কয়লাখনি অঞ্চলের একটি গ্রাম হলো কুসুমপুর। এই কুসুমপুরের জমিদার সুকান্ত রায়চৌধুরী ইংরেজ অঞ্চলে জমিদারির পাশাপাশি কয়লাখনির মালিক হন। তাঁর নাতি সুবিনয় মাইনিং পাশ করে কোলিয়ারি দেখাশুনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। সুবিনয় এ উপন্যাসের নায়ক। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কয়লাখনি অঞ্চলে পরিবর্তনের ঢেউয়ের প্রভাব দেখা যায়। আগে খনিতে যন্ত্রপাতি বিশেষভাবে ব্যবহৃত হতো না। স্বাধীনতার পরে বেশি মাত্রায় উৎপাদনের লক্ষ্যে মেকানিজমের যুগ আসে। আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহারে শ্রমিকরা বেকার হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় সুযোগসন্ধানী শ্রমিক নেতারা মালকাটাদের ক্ষেপিয়ে তোলে এবং তাদের দিয়ে ধর্মঘট করায়। খনিতে কয়লাকাটার কাজ বন্ধ হয়ে যায়। অন্যদিকে অযোধ্যাপ্রসাদ ও নটবর সেনের মতো তথাকথিত শ্রমিক নেতারা টাকা খেয়ে শীতল পরমেশ্বর সিংয়ের মতো খনি মালিকদের

বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে। কুসুমপুর একটি গ্রাম্য খনি অঞ্চল। কয়লাই কুসুমপুরের উৎকৃষ্ট সম্পদ। এই সম্পত্তিকে ঘিরেই কুসুমপুরের মধ্যে সকলের জীবন ব্যাপ্ত। একে ঘিরেই রাজনৈতিক ও শিক্ষাকর্ম পরিবর্ধিত হয়। নারীরাও এখানে পার্টি ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে থাকে। কিন্তু একসময় মালিকদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের আন্দোলনের ফলে সৎ মালিকরা মালিকানা হারিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। খনিগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয় এবং এর ফলে কেন্দ্রের অধিকারভুক্ত হয়ে ওঠে খনিগুলি। কুসুমপুরকে নিয়ে যে সৎ মালিকের উন্নয়নের স্বপ্ন ছিলো তা বাস্তবায়িত হতে পারেনি। কুসুমপুরের যৌবন ছিন্ন হলো।

'কয়লার রং কালো' উপন্যাসের পটভূমি আসানসোল সংলগ্ন কয়লাখনি। উপন্যাসে দেখি স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ইংরেজরা খনিগুলি দেশীয় জমিদার ও ধনী ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে চলে যায়। কিন্তু খনিগুলি দেশীয় শাসকদের শাসনাধীন হলে আদৌ মালিক-শ্রমিক শ্রেণির সম্পর্কের উন্নতি ঘটে নি বরং দেশীয় মালিকদের স্বেচ্ছাচারী মনোভাব খনিগুলিতে সর্বনাশ ডেকে এনেছিল। কোলিয়ারির হিসাববাবু ধনাই মিত্তির জানেন যে এখানে টিকতে হলে মালিক যা বলবে চোখ বন্ধ করে তাই করে যেতে হবে; কাজ দেখাতে গেলেই বিপদ। ম্যানেজারকে দেখা হলে সেলাম দিলেই চাকরি পাকা। ইঞ্জিনিয়ার অসীমবাবু যথেষ্ট পড়াশোনা করে পাশ করে এই কোলিয়ারিতে কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। কিন্তু তাঁর পরিশ্রমী, জ্ঞানপিপাসু মনোভাব জীবনে অন্ধকার ডেকে আনে। অর্থের প্রাচুর্যে অন্ধ হয়ে ধনাই মিত্তির বা বিহারীলাল তাদের খাদ্যাভ্যাস তথা জীবনযাত্রার মান কতটা নীচে নামতে পারে তার চিত্র সাহিত্যিক আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

প্রফুল্লকুমার সিংহের 'অনার্য দামোদর' (১৯৯৮) উপন্যাসটি ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের এক মাস ব্যাপী ধর্মঘটকে উপলক্ষ করে রচিত। স্বাধীনতা পরবর্তী যুগেও কয়লাখনির শ্রমিকদের কোনো পরিবর্তন আসেনি। অথচ দেশীয় মালিকদের হাতে কয়লার মালিকানা আসায় দেশ জুড়ে কয়লা খনিগুলিতে শুরু হয় নানা অব্যবস্থা ও লুঠতরাজ। পরিস্থিতি চরম পর্যায়ে পৌঁছলে শ্রমিকরাও সংগ্রামে লিপ্ত হতে বাধ্য হয়। শিল্প বিপ্লবের গতি সঞ্চার ও স্বাধীনতা উত্তর পর্বে কয়লা অঞ্চলে ট্রেড ইউনিয়নের প্রাণপণ সংগ্রামের সত্যনিষ্ঠ বিবরণ দাখিল করা হয়েছে এই উপন্যাসে।

স্বাধীনতার পরে ত্রৈমাসিক বোনাস ও প্রভিডেন্ট ফান্ড প্রচলিত হলেও অধিকাংশ মালিকরাই এই নিয়ম লঙ্ঘন করতেন। ছয় মাস চাকরির পরে প্রভিডেন্ট ফান্ড না দেওয়ার উদ্দেশ্যে শ্রমিক ছাঁটাই করে কিছুদিন পরে তাদের ক্যাজুয়াল শ্রমিক হিসাবে মনোনীত করা হতো। বোনাসের পরিবর্তে লুচি, বোঁদে আর সামান্য কিছু উপহার দেওয়ার কাহিনি বড়ো ভয়ঙ্কর — যা নীলকুঠির অত্যাচারকে হার মানায়। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। প্রতিবাদের গন্ধ পেলেই মালিকের পোষা গুণ্ডারা রাতের অন্ধকারেই তার শরীর লাশে পরিণত করে দিত। এইসব ঘটনা ঘটত বেলাবাদ, বাবুশোল, সিশিকেড, সামলা খনি, নিউ সাতগ্রাম, মডার্ন সাতগ্রাম-সহ বিভিন্ন খনিতে। তাই 'অনার্য দামোদর' উপন্যাসে অনন্তর কাছে শ্রমিকরা তাদের ভীতি প্রকাশ করেছিল —

"একজন বলল — বাবাজী আমরা ইউনিয়নের কথা জানি। আপনারা কি করতে চান তাও জানি। মনে মনে আপনাদের সাহায্যের তারিফ করি। সমর্থন করি। কিন্তু কি করবো? সরদাররা জানতে পারলে আমাদের জান খতম করে দেবে। বউ বিটির ইজ্জত লুট করে দেবে। দেশে যে ক্ষেতি-বাড়ি আছে তা বেদখল করে বাহ-মাকে ভিক মাঙ্গার দশা বানিয়ে দেবে।"[৪]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, দেশভাগ এবং স্বাধীনতা এইসব বৃহৎ ব্যাপারের মধ্যে কয়লাখনির কয়েক লক্ষ শ্রমিকের অনুকূলে জীবন-যাপন নিয়ে ভাববার অবসর কারো ছিল না। দেবেন সেন এসেছিলেন সেই ভাবনা নিয়ে। প্রজা সোসালিস্ট পার্টির কর্মীর কয়লাকুঠিতে শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের আপ্রাণ চেষ্টা লেগে আছে। কিন্তু কুলিকামিনরা এমন ধাতু দিয়ে তৈরি যে একটা প্লাটফর্মে একটা পতাকার নীচে দাঁড়াবার সাহস সঞ্চয় করতে পারছে না। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার প্রবণতা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের মাধ্যমে সূচিত হলেও মালিক ও প্রশাসনের মিলিত আক্রমণের সম্মুখীন হতে মজদুররা আই এন.টি.ইউ.সি., এ.আই.টি.ইউ.সি., হিন্দু মজদুর সভা প্রভৃতি ভিন্ন মতাদর্শী ট্রেড ইউনিয়ন খনি এলাকার শ্রমিকদের সংগঠিত করার কাজ শুরু করেছিলেন। রাজনৈতিক মতাদর্শের তীব্রতা সত্ত্বেও শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় তাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে লড়াই আন্দোলন গড়ে তোলেন। চিনাকুড়ি কোলিয়ারিতেই মজদুর সভার কার্যালয়ে বেঙ্গল কোল কোম্পানির কর্তৃপক্ষ ও পুলিশের যৌথ আক্রমণের বিরুদ্ধে শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম গড়ে তোলে। কর্তৃপক্ষ বৈঠক গৃহীত বেতন সংক্রান্ত শর্তের অবমাননা করায় এই ঘটনা ঘটে। শ্রমিকদের পাশে আসানসোল কোলিয়ারি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, স্যানরেল, মিউনিসিপ্যাল মজদুর ইউনিয়ন ও চিত্তরঞ্জন রেলওয়ে ইউনিয়ন সক্রিয় সমর্থন গড়ে তোলে। এর থেকেই এই অঞ্চলে শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণি-সংহতি গড়ে ওঠার চিত্র লক্ষিত হয়। কিন্তু এই সংগঠন গঠনের তোলার বিষয়টি ছিল খুব কঠিন। ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিক ঐক্য মালিক শ্রেণির কাছে এতটাই ভীতিপ্রদ ছিল যে তার জন্য খুন, জখম, নারী নির্যাতন, রাহাজানি, চাকরি থেকে বরখাস্ত — কোনো উপায়ই বাদ থাকত না। এক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ ম্যানেজার থেকে সর্দার বা

আড়কাঠি, গুণ্ডা — সবাইকে কাজে লাগাতো। এইভাবে রানিগঞ্জের অন্যতম ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী জগদীশ ঝা সিলেক্ট জামবাদ কোলিয়ারিতে প্রচার আন্দোলন গড়ে তোলার সময় আক্রান্ত হন।

আর একজন লেখক ছিলেন সুধীর রায়; ছদ্মনাম দেবদত্ত রায়। জন্ম ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ২ জানুআরি কুমিল্লায়। বঙ্গাবাসী কলেজ থেকে আই.এ. পাস করেন। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের রেলে চাকরি পান। রাজনীতি করার অপরাধে চাকরি যায়। পরবর্তীকালে শিক্ষকতার চাকরি পান ও লেখালেখি শুরু করেন। বামপন্থী ঘরানার লেখক ও অকৃতদার। অনেক ছোটোগল্প ও বেশ কয়েকটি উপন্যাস লেখেন। এর মধ্যে কয়লাখনি নিয়ে তাঁর তিনটি গ্রন্থ — 'কালো হীরার দেশে' (১৯৯০), 'হীরের চেয়ে দামী' (১৯৯৬) এবং 'ধস' (২০০১)। দেবদত্ত রায় রচিত 'কালো হীরের দেশে' উপন্যাসটির জাতীয়করণ পূর্ব কয়লা খনিরই চিত্র। ১৯৪২-৪৩ খ্রিস্টাব্দের বরাকর খনি অঞ্চলে কয়লা শ্রমিকদের ইউনিয়ন গড়ে ওঠে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই কয়লা শ্রমিকদের বেতনভাতা নির্ধারণের জন্য 'বোর্ড অফ কনসিলিয়েশন' গঠিত হয়। বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলন শুরু হয়। তার রেশ চলে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। প্রায় এক মাস ধরে লাগাতার হরতালের চিত্র এখানে রয়েছে। ১৯৫৫ থেকে ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধভাবে যে আন্দোলন চালায় তার ছবি এই উপন্যাস জুড়ে রয়েছে। জীবন ভট্টাচার্য নামে এক ব্রাহ্মণ নেতার নেতৃত্বে শ্রমিক সংগঠিত হয়ে কীভাবে শ্রমিক অধিকার অর্জনে সচেষ্ট হয় তার পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র বর্ণিত হয়েছে উপন্যাসটিতে।

খনি অঞ্চল কেন্দ্রিক উপন্যাস 'কালো হীরের দেশে'র নায়ক জীবন ভট্টাচার্য 'অনার্য দামোদর' (১৯৯৮) উপন্যাসের জগদীশের মতোই আক্রান্ত হন। সেখানে পুলিশও সক্রিয়ভাবে মালিকের সঙ্গে সহযোগিতা করে। তবে বহু ক্ষেত্রেই শ্রমিকরা প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলে দাবি আদায় সমর্থ হন। তবে খনি মালিকরা শ্রমিকদের এই ক্রমবর্ধমান শক্তিকে কোনোভাবেই বরদাস্ত করতে পারেনি। সেই কারণেই রতিবাটী কোলিয়ারিতে ওয়েস্ট বেঙ্গাল মাইনিং কোম্পানির দুটি পিটে শ্রমিকদের ওপরে অকারণ অত্যাচারের প্রতিবাদ জানালে প্রাণনাশের ভয় দেখানো হয়। খনি এলাকায় গুণ্ডা দিয়ে শ্রমিকদের দমিয়ে রাখার এই ছবিকেই কালো হীরের দেশের মধ্যে চিহ্নিত করা হয়েছে যেখানে ঝানু নাগ, জাগুশা প্রমুখ এই ধরনের কাজ করে। এ-সবের বিরুদ্ধে, খনি জাতীয়করণের দাবিতে, মজদুরদের সভায় খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের দাবিতে কমিউনিস্ট প্রভাবিত এ.আই.টি.ইউ.সি কলকাতা সম্মেলনে খনি শ্রমিকদের সর্বভারতীয় ফেডারেশন গঠিত হয়। সম্মেলনের আগে ট্রাইবুনালের রায় অনুসারে খনি শ্রমিকদের মজুরি ও মহার্ঘভাতা ২৫ শতাংশ বৃদ্ধির দাবি করে। শ্রমিকদের দাবিকে কিছুটা স্বীকৃতি দিয়ে এই সময় সারা ভারত কোলিয়ারি ট্রাইবুনাল মালিক অ্যাসোসিয়েশনের খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ বন্ধের আদেশ প্রত্যাহারের নির্দেশ দেয়। শ্রমিকদের এই জয়ে তাদের আত্মবিশ্বাসী করে তুলে জীবন ধারণের উপযুক্ত বেতন ও ভাতার দাবিতে সঙ্ঘবদ্ধ করে তোলে। কিন্তু খনি মালিকরা শ্রমিকদের এই শক্তি বৃদ্ধিতে আশঙ্কিত হয়ে আরও বেশি নিপীড়ন শুরু করে। এর ফলে মিঠাপুর খনিতে ন্যায্য দাবির বিরুদ্ধে মালিকের আদেশে শ্রমিকদের ওপরে পুলিশের গুলি চলে এবং লালবাজার খনিতে মাইনিং ইনচার্জ ব্রহ্মদেব শর্মা শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে মালিক-বিরোধী বক্তব্য রেখে গুণ্ডাদের দ্বারা প্রহৃত হন। কোলিয়ারি ট্রেড ইউনিয়নের সহ-সভাপতি ডোমন রায় ও সম্পাদক লালমোহন মাজি শ্রমিক ধাওড়াতে আক্রান্ত হন। এই ঘটনার প্রতিবাদে আসানসোলের ১১টি শ্রমিক সংগঠন শ্রমিক সংহতির নিদর্শন রেখে যুক্ত বিবৃতি দিয়ে খনি শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নের দাবিকে সমর্থন জানায়। এর পরেও মিঠাপুর রতিবাটিতে মালিকরা বেআইনিভাবে শর্ত লঙ্ঘন করে শ্রমিক ছাঁটাই, বকেয়া বেতন না দেওয়ার মতো অন্যান্য বিষয়গুলি বজায় রাখে। শ্রমিকরা ক্রমশ উপলব্ধি করে প্রচলিত পুঁজিবাদী কাঠামোয় সরকার মালিকশ্রেণির স্বার্থে চালিত হন। সে কারণে খাদ কাজোড়ার মতো খনি কোলিয়ারি মজদুর সভার ইউনিয়ন ভাবতে অস্বীকার করায় কর্তৃপক্ষ খনি বন্ধ করেন এবং অন্যদিকে জমিদারি দখল বিলের আওতায় খনি মালিকদের মধ্য স্বত্ব দখলের বিনিময়ে সরকার ক্ষতিপূরণের সুপারিশ করে। উপন্যাসে মাধবপুরের ম্যানেজার সেই কারণেই বলেন —

"যে সরকার আমাদের পক্ষে আইন করবে না, আইন পাল্টাবে না, সেই সরকারকে আমরা গদিতে থাকতে দেব কেন? ওদের পেছনে পয়সা ঢালছি কি শুধু প্রেমে পড়ে?"[৫] সমসাময়িক খনির এই সাহিত্যিক দলিল থেকে সরকার ও খনি মালিক আঁতাত অনেকটাই স্পষ্ট হয়। এই আক্রমণ প্রতিহত করতে রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে একজোট হয়ে ওঠেন। খনি শ্রমিকদের এই ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য।

খনিকেন্দ্রিক বাংলা সাহিত্যের পরিচিতি বৃহত্তর বাংলা সাহিত্যের পরিধিতে খুবই স্বল্প। অথচ বহু সাহিত্যিকের উপন্যাস ও ছোটোগল্পে খনিশ্রমিকদের জীবনের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ কাহিনি উঠে এসেছে। খনিশ্রমিকদের সঙ্কটময় জীবন নিরন্তর বলেই এখনো তারা আঞ্চলিক লেখকদের সাহিত্য রচনার প্রেক্ষাপট রচনা করে চলেছে। সাহিত্য সমাজের দর্পণ তাই বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাবার পথে যে-কোনো সমাজের মাঝে মাঝে ঐতিহ্য ও ইতিহাসের দিকে পিছু ফিরে দেখা দরকার। সাহিত্য যুগে

যুগে এই দায়িত্ব বহন করে চলেছে। দেশ স্বাধীন হলেও খনিকর্মীরা সেই অন্ধকারেই রয়ে গেছে। প্রায় পঁচিশ বছর অপেক্ষার পর কিছুটা পরিবর্তন আসে তাদের জীবনে। শৈলজানন্দ যে ধারার ছোটোগল্পের মাধ্যমে সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন সেই পথেই কথাসাহিত্যের ধারায় লেখকদের কলমে জাতীয়করণ পূর্ববর্তী খনি অঞ্চলের মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক ও জীবনযাত্রার বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে।

তথ্য সূত্র :

১। 'শিল্প, শিল্পশ্রমিক ও বাংলাসাহিত্য', নন্দ চৌধুরী, একুশ শতক পত্রিকা, মাসিক, পঞ্চদশ বর্ষ, একাদশ সংখ্যা, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রকাশ ২০২০, পৃ. ৩৫
২। 'মহাকালের ঘোড়া', প্রফুল্লকুমার সিংহ, (প্রথম পর্ব), অরণি প্রকাশনী, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৬, ভূমিকা
৩। 'কয়লা খনির শ্রমিক এক দশকের জীবন ও সংগ্রাম', সুনীল বসু রায়, 'সুনীল বসু রায়ের নির্বাচিত রচনা সংকলন', কোলিয়ারী মজদুর সভা, রানিগঞ্জ, বর্ধমান ৭০০০৫৮, প্রকাশ ২০০৩, পৃ. ১৬
৪। 'অনার্য দামোদর', সিংহ প্রফুল্লকুমার, চিরায়ত প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০০০৯, ১৯৯৮, পৃ. ১০৫
৫। 'কালো হীরের দেশে', দেবদত্ত রায়, যোধন প্রকাশনী, পশ্চিম বর্ধমান ৭০০০৩৫, প্রথম প্রকাশ ১৯৯০, পৃ. ৯৯

লেখক পরিচিতি :

ঝুমা পাত্র : অসম বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষিকা। পশ্চিম বর্ধমানের রানিগঞ্জ গার্লস কলেজের স্যাক্ট শিক্ষক।